স্বাধীনতা সংগ্রামে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

স্বাধীনতা সংগ্রামে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

পরিবেশনায়

খানকাহে হুসাইনিয়া দারুল ইসলাহ

ইলামবাজার, বীরভূম, (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)

SWADHINATA SANGRAME ULAMA E DEOBANDER ABODAN,

By: Mohd. Abdul Alim

Published by Farhan Akhtar Al Noman

Saljore, Lokepure, Birbhum, (W.B),

Mob: +91 8926199410/ 91 9635458331

Rs. 30.00

প্রথম প্রকাশঃ এপ্রিল ২০১৭, চৈত্র ১৪২৪

৩০ টাকা

প্রকাশকঃ ফারহান আখতার আল নুমান

শালজোড়, লোকপুর, বীরভূম, (পঃ বঃ)

উলামায়ে দেওবন্দের আন্দোলন

মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) আগে ও পরে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে দেওবন্দী উলামায়ে কেরামদের ভূমিকা ছিল অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ । শাহ ওয়ালীউল্লাহর রাজনৈতিক আন্দোলনকে তাঁরাই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন । দারুল উলুম দেওবন্দ সম্পর্কে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গণী খান চৌধুরী বলেছেন, "এই মাদ্রাসা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মহান ব্যক্তিত্ব উপহার দিয়েছে এবং সর্বসাধারণের মধ্যে বিশেষ করে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের ভাবনা সৃষ্টি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে ।" (আল জমিয়ত, দারুল উলুম সংখ্যা, পৃষ্ঠা – ২৪৬)

প্রখ্যাত গবেষক, স্বাধীনতা প্রেমিক ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক সত্যেন সেন লিখেছেন, "দেওবন্দ শিক্ষাকেন্দ্র ও আলীগড় শিক্ষাকেন্দ্র এই উপমহাদেশের মুসলমানদের কাছে বিশেষ পরিচিত । অবশ্য আজকালকার দিনের শিক্ষিত তরুন মুসলমানেরা আলীগড়ের নাম যেভাবে জানে দেওবন্দের নাম তেমন ভাবে জানে না । হিন্দুদের পক্ষে একথা সত্য, আলীগড়ের কথা তারা অনেকেই জানে কিন্তু দেওবন্দের কথা খুব কম লোকই জানে । অথচ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেওবন্দ শিক্ষাকেন্দ্র যে দেশ প্রেমিক ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে, সেজন্য হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের কাছেই তা স্মরনীয় থাকা উচিৎ ছিল ।" (দেওবন্দ ও ফুরফুরা সিলসিলার ময়নাতদন্ত, পৃষ্ঠা – ১৯)

উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বীর বাহাদুর সিং বলেছেন, “আজ (২৬ নভেঃ ১৯৮৫) দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় আসার সুযোগ হল । এই প্রতিষ্ঠানে হাদীস, তফসীর বিষয় পড়ানোর সাথে সাথে আরবী সাহিত্য, বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র ও ইউনানী চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি পড়ানো হয় । দেশ বিদেশ থেকে ছাত্ররা এখানে এসে শিক্ষা অর্জন করে । এই প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । এখানের ব্যবস্থাপনা উন্নত্মানের । আমি ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল কামনা করি ।” (দারুল উলুম দেওবন্দ, পৃষ্ঠা – ৭৭)

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলী আহমেদ (১৯৭৬) বলেছেন, “দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত । এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাও আধ্যাত্মিক জ্ঞান জগৎবাসীর অন্তর উজ্জ্বল করেছে । এই গৌরবময় ব্যক্তিত্ব গুলো দেশের রাজনীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারনামা আঞ্জাম দিয়ে নিজেদের গৌরব পতাকা উড্ডিন করেছেন । একথা সকলের জানা যে এই প্রতিষ্ঠান দেশে শিক্ষা সমাজ ও রাজনীতির সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে ।” (দারুল উলুম দেওবন্দ, পৃষ্ঠা – ৭৪)

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী (১৯৮০) বলেছেন, “দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার পূর্বসূরীগণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছিলেন করেছিলেন । যার কারণে দেশবাসীর মনে স্বাধীনতা অর্জন করার প্রেরণা ও উচ্চাশা সৃষ্টি করেছিল । আর এই প্রচেষ্টার ফলস্বরুপ ভারতবর্ষ স্বাধীন হল । ইসলাম এবং মুসলমান এই দেশকে অনেক কিছুই দিয়েছে । ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে এবং দেশের জীবন ব্যবস্থায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে ।” (দারুল উলুম দেওবন্দ, পৃষ্ঠা – ৭৬)

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ (১৯৫৭) বলেছেন, "ওই সকল উলামা যারা দারুল উলুম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন । দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পূর্বে ও পরে ওই সকল উলামাগণ স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়ে যান । তাঁরা আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের সাথে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করেন ।" (দেওবন্দ মাদ্রাসায় প্রদত্ত ভাষন, দারুল উলুম দেওবন্দ, পৃষ্ঠা – ৭২)

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক গৌরী শঙ্কর দত্ত লিখেছেন, "হিন্দু ও মুসলমান আলাদা জাত, তাই এক সঙ্গে থাকা সম্ভব নয়, মূলত এই দ্বিজাতি তত্ত্বের ঠ্যালায় দাঙ্গা হয়েছে, সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়েছে, জন্ম নিয়েছে পাকিস্তান । তার পর থেকে চলছে অপপ্রচার শয়তানি, সব মুসলমানই নাকি পরাধীন ভারতে মুসলিম লিগ করত এবং স্বাধীনতার লড়াইয়ে তাদের কোন ভূমিকায় ছিল না । এই মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিলে ইতিহাসকেই অস্বীকার করা হবে । অধিকাংশ হিন্দুই যেমন ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু মহাসভা বা সংঘপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কহীন ছিলেন তেমনই ভারতের মুসলমানরাও অনেক 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' ও মুসলিম লিগের বিরোধীতা করে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন, যুক্ত হয়েছিলেন কংগ্রেস এবং নিজস্ব ফোরাম হিসাবে গড়ে তুলেছিল 'জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ' ।

১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের আবির্ভাব হলে, তাতে মুসলমানেরা যেন যুক্ত না হয় এবং মুক্তি সংগ্রামে তারা যে অংশ না নেয়, এই মর্মে আহ্বান জানিয়েছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষা – সভ্যতার সমর্থক ‘প্রগতিশীল শিবিরের’ স্যার সৈয়দ আহমেদ খান ও তাঁর আলীগড় স্কুল । বাস্তব দ্বিজাতি তত্ত্বের উদ্ভব সেদিনই ঘটেছিল । অভিজাত ধনাঢ্য শিক্ষিত মুসলমানদের একটি বড় অংশ ছিলেন এই মতের শরিক এবং তারাই **১৯০৬** সালে গড়ে তুলেছিল মুসলিম লিগ, তুলেছিলেন পাকিস্তানের দাবি । আর গ্রাম – ভারতের কৃষিজীবী মুসলমান, ‘সেকেল – মার্কা’ পাশ্চাত্য সভ্যতা যাদের সংক্রমিত করতে পারে নি, ধর্মগুরু মুসলমানেরা সিপাহী বিদ্রোহের ন’বছর বাদে গড়েছিলেন ‘দেওবন্দ মাদ্রাসা’, একে বারে সাধারণ গরিব মুসলমানদের দিশা দেখানোর জন্য । **১৮৭৯** সালে উন্নীত হল ‘দারুল উলুম’-এ । এরই প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসিম নানোতুভি ভারতের মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ‘ফতোয়া’ জারি করেছিলেন যে, এখন ইংরেজরাই ইসলামের বড় শত্র, মুসলমানকে আজাদির লড়াই লড়তে হবে, এবং কংগ্রেসও তাদের করা দরকার । এইসব ফতোয়া গ্রন্থিত আছে Nusratal Ahrar বা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মদত সংকলনে । দারুল উলুমে অধ্যক্ষ মাওলানা হুসেন আহমদ মাদানী **১৯১৯** সালে দারুল উলুমের রাজনৈতিক বাহু হিসাবে তৈরি করেন ‘জমিয়ত ইউলামায়ে হিন্দ’, যা পরিণত হল জাতীয় কংগ্রেসের অঙ্গে । জিন্না ও কবি ইকবালের পাকিস্তান প্রস্তাব ও দ্বিজাতি তত্ত্বের সক্রিয় ধর্মীয় বিরোধীতা করে মাওলানা মাদানী লিখলেন ‘মুত্তাহিদা ও কওমিয়াত ঔর ইসলাম’ Compaslie Nationalism and Islam সম্মত নয় যাতে তিনি পবিত্র কোরাণ শরীফ থেকে উদ্ধৃত করে দেখালেন যে, এমনকি পয়গম্বর হজরত মুহাম্মদ যখন মক্কা থেকে চলে গিয়ে মদিনাতে বাস করেছিলেন, তখন সেখানে মুসলমান ইহুদি ও পৌত্তলিক আরবদের সমন্বয়ে গড়েছিলেন Ummah Wahidah, যাঁদের স্বীয় ধর্মচারণের স্বাধীনতা

এবং বহিঃশত্রু ইংরেজদের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমানকে এক হয়ে লড়তে হবে, স্বাধীন দেশে স্বীয় ধর্মাচারণের অধিকার নিয়েই একত্রে বসবাস করতে হবে এবং পাকিস্তান প্রস্তাব ইসলামকে এক হয়ে লড়তে হবে, স্বাধীন দেশে স্বীয় ধর্মাচারণের অধিকার নিয়েই একত্রে বসবাস করতে হবে এবং 'পাকিস্তান দাব' সম্পর্কে কিন্তু এক সময় তাঁদেরই বক্তব্য ছিঃ "কমিউনিষ্ট পার্টিই একমাত্র পাটি যে মুসলিম লীগের পাকিস্তানের দাবিকে ন্যায্য দাবী বলিয়া মানিয়া লইয়াছে,......." (পৃষ্ঠা – ৩৩৯, প্রথম খণ্ড, বাংলায় কমিউনিষ্ট আন্দোলন, দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রধান সম্পাদক অনিল বিশ্বাস, এন বি এ)! এদের কথা শুনে ঘোড়াও হাসবে না!" (বর্তমান, ৩০/০১/২০০৭)

সুতরাং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেওবন্দের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে বলে ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করেছেন ।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এর চেতনার উত্তরসূরী উলামায়ে দেওবন্দের আন্দোলনকে মোটামুটি ৩ ভাগে ভাগ করা যায় ।

১) শাহ ওয়ালীউল্লাহ থেকে বালাকোট পর্যন্ত ।

২) বালাকোট থেকে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ।

৩) দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত ।

প্রথম পর্যায়ের আন্দোলনে নেতৃত্য দিয়েছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী, শাহ আব্দুল আজীজ দেহলবী ও সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ । এর আগে প্রথম খণ্ডে এঁদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত চিত্রায়ন করা হয়েছে । বালাকোটের প্রান্তরে সৈয়দ

আহমদ শহীদের শাহাদাত বরণ করার পর এ আন্দোলন মোটামুটি তিনটি কেন্দ্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে । এর মধ্যে একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল দিল্লী । এখানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শাহ ইসহাক (রহঃ), তাঁর হিজরতের পর মাওলানা আব্দুল গণী তার পরে মাওলানা মামলুক আলী ও তারপর হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ) । অপর কেন্দ্রটি ছিল পাটনায় । এখানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মাওলানা ইনায়েত আলী ও মাওলানা বিলায়েত আলী ও ফারহাত আলী । আর একটি কেন্দ্র সিত্তানা দুর্গকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল । এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মাওলানা বেলায়েত আলী, মাওলানা ফয়েজ আলী, ইয়াহইয়া আলী ও আকবর আলী প্রমুখ উলামায়ে কেরামবৃন্দ ।

এ সকল কেন্দ্র থেকে সারা দেশে ইংরেজ বিরোধী গণজাগরণ সৃষ্টির অব্যাহত প্রচেষ্টা চলতে থাকে । ফলে সারা দেশেই কোম্পানীর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ গড়তে থাকে । সে চেতনার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশেও ব্যাপক সাড়া জাগে । ফারাজী আন্দোলন (যা শরীয়াতুল্লাহর পুত্রের নেতৃত্বে বিরাট গণআন্দোলনের রুপ নেয়), সৈয়দ আহমদ শহীদের খলিফা সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের আন্দোলন সহ ছোট বড় বহু আন্দোলন বাংলাদেশী অঞ্চলে গড়ে উঠে এবং ইংরেজবিরোধী তৎপরতায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে ।

এইভাবে সারা দেশের আনাচে কানাচে আলেম উলামাদের উদ্যোগে কোম্পানীর শাসন ও শোষনের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ চরম রুপ ধারণ করে । গোপনে গোপনে সারা দেশে চুড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি চলতে থাকে । সেনাবাহিনীতেও এ চেতনা সম্প্রসারিত হয় । দেশীয় সৈন্য ও ব্রিটিশ সৈন্যদের মাঝে বৈষম্যমূলক আচরণ ও দেশীয় সৈনিকদের

অর্থনৈতিক দুরাবস্তা এবং তাদেরকে ব্রিটিশ ইচ্ছামত বহিঃরাষ্ট্রে প্রেরণের বাধ্যতামূলক আইনসহ ধর্মীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক অনাচার সেনাবাহিনীকে ক্ষেপিয়ে তুলে । ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতাকামী আলেম সমাজের নেতৃত্বে সেই চেতনা সিপাহী জনতার গণবিদ্রোহের রুপ ধারণ করে । পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে সেনাবাহিনীর অব্যন্তরে এনফিল্ড রাইফেলে শূকর ও গরুর চর্বি মিশ্রিত টোটা ব্যবহারে অসম্মতি জ্ঞাপনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেনাবাহিনীতে যে বিদ্রোহ দেখা দেয় তা ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীদের প্রধান প্রধান কেন্দ্র – দিল্লী মিরাট, লক্ষৌ, কানপুর, বেরেলী ও ঝাঁসীসহ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে । তার সাথে এদেশের স্বাধীনতাকামী জনতা একাত্ম হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে । সারা দেশের আনাচে কানাচে দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে এ যুদ্ধ । এ সময় মূল নেতৃত্ব দেওয়া হয় দুটি কেন্দ্র থেকে । এর একটি ছিল দিল্লীর সন্নিকটে থানাভবনে আর অপরটি ছিল আম্বালায় । দিল্লী কেন্দ্রিক অঞ্চলের নেতৃত্বে ছিলেন হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মাওলানা কাসিম নানুতুবী প্রভৃতি উলামাবৃন্দ । ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় সে অঞ্চলে তাঁরা একটি স্বাধীন সরকারের ঘোষনাও দিয়ে ফেলেছিলেন । হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীকে আমীর, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীকে প্রধান বিচারপতি ও কাসিম নানুতুবীকে প্রধান সেনাপতি করে এ সরকারের অবকাঠামো ঘোষণা করা হয় । অপর কেন্দ্রটি ছিল আম্বালায় যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মাওলানা জাফর থানেশ্বরী ও মাওলানা ইয়াহইয়া আলী । তাছাড়া কানপুরেও স্বাধীন সরকারের ঘোষনা করা হয় । সৈয়দ আহমদ শহীদের খলিফা আজিমুল্লাহ খান ও নানা সাহেব এর নেতৃত্ব দেন । অযোধ্যায় এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সাবেক অযোধ্যার বেগম হযরত মহল ও আমানুল্লাহ । বেরেলীতে নেতৃত্ব

দেন হাফেয রহমত খানের বংশধর খান বাহাদুর খান । খান বাহাদুর খান নিজকে দিল্লীর সম্রাটের স্থানীয় প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেন । স্বাধীনতাকামীরা দিল্লী দখল করে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারত সম্রাট বলে ঘোষণা দেয় । পাটনা ও সিত্তানায়ও তখন পর্যন্ত পুরাতন কেন্দ্রগুলি বিদ্যমান ছিল । সেখান থেকেও স্বাধীনতার চেতনা অব্যাহতভাবে বিতরণ করা হতে থাকে ।

১৮৫৭ সালে কোম্পানীর শোষন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে যে গণবিদ্রোহ দেখা দেয় তার কারণ কি ছিল সে সম্পর্কে ইংল্যান্ড সরকার কোম্পানীর কাছে রিপোর্ট চাইলে ডাঃ উইলিয়াম লিওর এ মর্মে রিপোর্ট প্রদান করেছিলেন যে, “১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের গণ-বিদ্রোহ মূলতঃ ছিল মুসলমানদের আন্দোলন, আর তার নেতৃত্ব দিয়েছিল আলেম সমাজ । সুতরাং এ বিদ্রোহকে নির্মূল করতে হলে মুসলমানদের জেহাদী চেতনাকে বিলুপ্ত করতে হবে; আর সে চেতনার মূলমন্ত্র আল – কুরআন ও তার বাহক উলামা সমাজকে নির্মূল করে ফেলতে হবে ।”

এ রিপোর্টের ভিত্তিতে শুরু হয় আলেম উলামা নিধনের মহোৎসব । ইতিহাসের সবচেয়ে লোমহর্ষক নির্যাতনের শিকার হয় এ উপমহাদেশের আলেম উলামারা । সে সময় প্রায় ৫৮ হাজার আলেম উলামাকে ফাঁসী দিয়ে শহীদ করা হয় । আন্দামান, মাল্টা, সাইপ্রাস, কালাপানিতে দ্বীপান্তর করা হয় হাজার হাজার আলেম উলামাকে । উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদব বলেছেন, “১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ৫২/৫৩ হাজার মাওলানাকে গুলি মেরে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল । এই কথা আজ জোর গলায় বলছি ।” (কোলকাতা নেতাজী ইন্ডোর ষ্টেডিয়ামে প্রদত্ত ভাষন, তাং ১৬/১০/১৯৯৭)

এ বিদ্রোহের নেতৃত্বদানের অপরাধে মাওলানা জাফর থানেশ্বরী, মাওলানা ইয়াহইয়া আলী ও মাওলানা ফজলে হক খাইরাবাদী প্রভৃতি আলেমদেরকে ফাঁসীর হুকুম দেওয়া হয় । আম্বালা জেল থেকে তাদের লাহোর জেলে পাঠানো হয়, সেখান থেকে মুলতান কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে তাঁদের ফাঁসীর হুকুম কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয় । ফাঁসীর হুকুমকে তাঁরা অম্লান বদনে মেনে নিয়ে রাতদিন জেলে প্রকোষ্ঠে বসে যে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করেন তাতে ইংরেজ জেলার বিস্মিত হয় এবং তাঁদের নিকট এ উল্লাসের কারণ জানতে চাইলে তাঁরা জানান, "শাহাদাতই আমাদের চুড়ান্ত কাঙ্খিত ও কাম্যবস্তু, তাই যেহেতু পেয়ে গেলাম সুতরাং আনন্দ করব না কেন?" ফলে তাঁদের ফাঁসীর হুকুম বাতিল করে দিয়ে তাদেরকে দ্বীপান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয় । সেই নির্বাসিত জীবনে তাদের উপর যে, অকথ্য নির্যাতন চালানো হয় তা ইতিহাসের পাঠককে স্তম্ভিত করে ।

১৮৫৭ সালের ব্যাপক গণবিদ্রোহের রিপোর্টের ভিত্তিতেই ১৮৫৮ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়ার এক ফরমান বলে কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটিয়ে সরাসরি ব্রিটিশ সরকার এ দেশের শাসন ভার গ্রহণ করে এবং বৃটেন তার ক্ষমতাকে সুসংহত করার জন্য নতুন তৎপরতায় লিপ্ত হয় । দমন নীতিকে আরো বলিষ্ঠ ও জোরালো করা হয় ।

দারুল উলুম দেওন্দের প্রতিষ্ঠা

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষের শাসন ভার এসে পড়েছিল ব্রিটিশ বেনিয়াদের উপর । শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (রহঃ) ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের এবং ব্রিটিশ রাজ কায়েমের প্রত্যক্ষদর্শী । উলামায়ে দেওবন্দ মূলতঃ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (রহঃ) এর উত্তসূরী ।

হযরত ওমর (রাঃ) এর যুগ থেকেই ভারতে ইসলামের সূচনা হয় । সেই যুগ থেকেই 'মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী'র পতাকাধারী এক জামাআতের নিরলস প্রচেষ্টায় হিন্দু প্রধান ভারতে মুসলিম শাসন কায়েম হয় । বহু জটিলতার মুকাবিলা করে উলামায়ে কেরামগণ এদেশে মুসলিম কৃষ্টি কালচার কায়েম করেন । কখনো মনে হয়েছে আর বুঝি সামলানো সম্ভব হবে না । কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীনকে টিকিয়ে রাখার জন্য বারে বারেই খুলে দিয়েছেন রহমতের দ্বার ।

মুঘল সম্রাট আকবরের যুগে তাঁর মুর্খতার সুযোগ নিয়ে হিন্দু ব্রাহ্মন্যবাদীরা এবং শিয়ারা যখন ক্ষমতালোভী সম্রাটের ছত্রছায়ায় নিজের কুটিল চানক্যমুর্তীকে আড়াল করে ব্রাহ্মন্যবাদী ও শিয়াদের দর্শন উপাদানে গঠিত হয় 'দ্বীন – ই – ইলাহী' নামে এক মনগড়া ধর্ম । এই ধর্ম মুসলিম উম্মাহর প্রাণ শক্তিকে নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছিল । তখন মুজাদ্দিদে আলফে সানী আল্লাহর উপর পরম ভরসা নিয়ে এগিয়ে আসেন এবং ব্রাহ্মন্যবাদের সমস্ত ষড়যন্ত্রের জালকে ছিন্ন করে দিলেন ।

অষ্টাদশ শাতাব্দীতে ভোগবাদী বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের উপর ভিত্তি করে যখন ইসলামকে প্রতিহত করার জন্য রুখে দাঁড়াল তখন শাহ ওয়ালীউল্লাহ এই বাতিলকে

রুখার জন্য নবী (সাঃ) এর সুন্নতের আলোকে নতুন রুপরেখা তৈরী করলেন । সেই চেতনায় সমৃদ্ধ 'মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' – এর আলোয় গড়া আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের সংগ্রামী ধারার উত্তরাধীকার বহন করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঐতিহাসিক মাদ্রাসা দারুল উলুম দেওবন্দ । ভারতীয় মুসলমানদের এক নাজুক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইসলাম ও মুসলিম সভ্যতা এবং সংস্কৃতির এক চরম অবক্ষয়ের এক ঘনায়মান অমানিশা এ ঐতিহ্যবাহি সংগ্রামী প্রাতিষ্ঠানিক ধারাটি সূচনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তৈরী করেছিল ।

ইউরোপে যখন শিল্পবিপ্লব শুরু হয় তখন ইউরোপের পুঁজিবাদী বুর্জোয়া গোষ্ঠী কাঁচামাল আহরণ ও নতুন বাজার তলাশের জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং যে কোন মূল্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ও উপনিবেশ স্থাপনের জন্য আদাজল খেয়ে ময়দানে নেমে পড়ে । ভাসকোদাগামার নেতৃত্বে তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরী উপমহাদেশের রাস্তা আবিস্কারের পর সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের এক নতুন দিগন্ত খুলে যায় । দলে দলে তারা উপমহাদেশের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে এসে ভীড় জমাতে থাকে এবং গণবিচ্ছিন্ন ও অপরিনামদর্শী তৎকালীন রাজন্যবর্গের খেয়ালী বাদান্যতায় বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপন করতে থাকে । ইংরেজ বেনিয়ারা আর থেমে থাকে কোথায়? তারাও এ সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করল । তারাও ব্যবসা স্থাপনের জন্য এদেশে পাড়ি দিল । কিন্তু তারা শেষে ছলে বলে কলে কৌশলে এবং বিশ্বাসঘাতকতার ষড়যন্ত্রে এই ভারতীয় উপমহাদেশকে গ্রাস করে নেয় । কবির ভাষায় "বনিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রুপে ।" তাদের এই অবৈদ আগ্রাসনের ফলে ভারতীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে এক

অস্থিরতার সৃষ্টি হয় এবং ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুনের উপর এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে নেমে আসে মারাত্মক ধ্বংসযজ্ঞ । এর পরের ইতিহাস সকলেরই জানা ।

ভারতীয় উপমহাদেশের সুর্যপুরুষ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (রহঃ) আগে থেকেই তাঁর বিপ্লবী চিন্তার বদৌলতে আগত বস্তুবাদী দর্শনের বিধ্বংসী সয়লাবের অশুভ পরিণাম অনুমান করতে পেরেছিলেন । কেননা তিনি সচক্ষে দেখেছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের পতন আর ব্রিটিশ রাজশক্তির উত্থানের ধারাবাহিক ইতিহাস । তাই তিনি অশুভ পরিণাম অনুমান করতে পেরেই 'মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' – এর আদর্শিক আঙ্গিক অক্ষুন্ন ও সমুন্নত রাখার জন্য কুরআন সুন্নাহ ও আকাবিরদের জীবনাদর্শের নতুন আঙ্গিকে পেশ করেছিলেন ইসলামী জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার অভিনব দর্শন ও অবকাঠামো এবং সর্বত্র দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলার জন্য মুসলিম উম্মাহকে উপহার দিয়েছিলেন একটি বেগবান ও কার্যকারী কর্মসূচী ।

দিল্লীতে তাঁরই সুযোগ্য পুত্র শাহ আব্দুল আজীজ দেহলবী (রহঃ) পিতার প্রদত্ত কর্মসূচীর আলোকে নতুন বিপ্লবের জন্য লোক গড়ে তুলেন । তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন সারা দেশ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ বেনিয়াদের করতলগত, তারা দিল্লীর গণবিচ্ছিন্ন, অসহায়, নামে মাত্র ক্ষমতাসীন সম্রাটের কাছ থেকে এই ফরমান আদায় করে নিয়েছিল যে "পৃথিবী আল্লাহর, দেশ বাদশাহর আর হুকুম চলবে কোম্পানী বাহাদুরের ।" সেই সময় শাহ আব্দুল আজীজ দেহলবী দ্বিধাহীন, নির্ভিক ও উদাত্ত কণ্ঠে ফতোয়া জারি করেছিলেন, "ভারত এখন দারুল হারব" (অর্থাৎ শত্রু কবলিত দেশ) সুতরাং প্রতিটি দেশবাসীর জন্য কর্তব্য হল এই দেশ স্বাধীন করা এবং ব্রিটিশ বেনিয়াদের দেশ

থেকে বিতাড়িত করা । সারা দেশে দাবানলের মত এই ফতোয়া ছড়িয়ে পড়ল । সৈয়দ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাইল শহীদ এর নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী জমায়েত হতে লাগল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাহাড়ের পাদদেশে সিত্তানা দুর্গে । ব্রিটিশদের হীন চক্রান্ত ও তাদের প্রেতাত্মাদের বিশ্বাসঘাতকতায় ঐতিহাসিক বালাকোট প্রান্তরে শহীদদের তালিকায় রক্তাক্ষরে লেখা হল মুক্তিপাগল স্বাধীনতাপাগল মুজাহিদীনদের নাম । দুই শহীদের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও স্বাধীনতার আন্দোলন এখানে থেমে যায় নি । আন্দোলনের ধারা অব্যাহত ছিল । স্বাধীনতাকামী আলেমদের নেতৃত্বে ১৮৫৭ সালে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গণআন্দোলনে রুপান্তরিত হয় । ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের রিপোর্ট অনুযায়ী উলামায়ে দেওবন্দের ষড়যন্ত্রেই ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হয় । পরে তা সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং গণবিদ্রোহে পরিণত হয় । এক পর্যায়ে উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার থানাভবনকে কেন্দ্র করে এক স্বাধীন এলাকার সৃষ্টি হয় । শাহ ওয়ালীউল্লাহর ভাবশিষ্য হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ হঃ)কে আমীরুল মোমেনীন, মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ)কে প্রধান সেনাপতি, ও মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ)কে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করা হয় । কিন্তু কিছু দেশীয় কিছু ব্রিটিশদের পদলেহীদের বিশ্বাসঘাতকতায় ১৮৫৭ সালের মহান স্বাধীনতা আন্দোলন আপাত ব্যার্থ হয় । স্বাধীন থানাভবন সরকারেরও পতন হয় এবং হাফেয জামান শহীদ হন । অন্যান্য নেতাগণ আত্মগোপন করেন । ব্রিটিশদের গোয়েন্দা রিপোর্টে লেখা আছে, “দেওবন্দ মাদ্রাসা মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিমের প্রতিষ্ঠিত । তিনি বিখ্যাত আলিমে দ্বীন । তথাপি সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ বিরোধী ষড়যন্ত্রে মৌলবী হাজী ইমদাদুল্লাহর সঙ্গে জোটবদ্ধ হ’ন । এই দুই মৌলবীকে আত্মগোপন করতে হয়েছিল ।

হাজি ইমদাদুল্লাহ গোপনে দেশত্যাগ করে হেজাজে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন । কয়েক বছর পর সেখানেই তিনি মারা যান । মৌলবী মুহাম্মাদ কাসিম ভারতেই থেকে গেলেন । তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চলেছিল ।" (তাহরিকে শায়খুল হিন্দ, সৌজন্যে, ইণ্ডিয়া অফিস, লণ্ডন)

এখানে ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্টে সামান্য ভূল থেকে গেছে । মাওলানা কাসিম নানুতুবীকে গ্রেফতার করা হয়নি । গ্রেফতার করা হয়েছিল মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীকে ।

এরপর শুরু হয় উলামায়ে কেরামদের উপর লোমহর্ষক নির্যাতন । লক্ষ লক্ষ উলামায়ে কেরামদেরকে প্রকাশ্যে জবাই করে শহীদ করা হয় । উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদব বলেছেন, "১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ভারত ছাড়ো আন্দোলন থেকে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের স্বাধীনতা লাভ পযন্ত মুসলমানদের অবদান বেশী । দেশের জন্য যে কুরবানী তাঁরা দিয়েছেন অন্য কোন জাতি সে কুরবানী দিতে পারেনি । ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ৫২/৫৩ হাজার মাওলানাকে গুলি মেরে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল । এই কথা আজ জোর গলায় বলছি ।" (কোলকাতা নেতাজী ইন্ডোর ষ্টেডিয়ামে প্রদত্ত ভাষন, তাং ১৬/১০/১৯৯৭)

লর্ড ক্যানিং বলেছেন, "মহাবিদ্রোহ দমন করার পর ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১লা অক্টোবর এলাহাবাদের মহাবিদ্রোহের তিন প্রধান সমরনায়ক মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ), মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহঃ) ও হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ)

ব্যাতিত সমস্তকে মহারানী ভিক্টোরিয়ার পক্ষ থেকে নিঃশত ক্ষমা ও নিরাপত্তার ঘোষনা দেন ।” (ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উলামায়ে কেরামদের অবদান, পৃষ্ঠা – ২৭)

সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষদশী ঐতিহাসিক মিঃ টমসন বলেছেন, “দিল্লীর চাঁদনী চক থেকে খয়বার পযন্ত এরুপ কোন গাছ ছিল না, যার ডালে উলামায়ে কেরামদের গরদান ঝুলেনি ।”

তিনি আরও বলেছেন, “আলেমদেরকে শূকরের চামড়ার ভিতর ভরে জ্বলন্ত চুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল । লাহোরের রাবী নদীতে বস্তার ঢুকিয়ে ৮০ জন আলিমকে প্রতিদিন নিক্ষেপ করা হত । এবং তাদের অনেককে গুলি করা হত ।”

তিনি আরও বলেন, “চল্লিশজন আলিমকে জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গে উলঙ্গ করে জ্বালানো হচ্ছে । তারপর আরও চল্লিশজন আলিমকে জ্বালানোর জন্য সেখানে আনা হল । সেখানে ইংরেজরা তাদের সম্বোধন করে বলেছিলঃ মৌ্লবীর দল উক্ত ৪০ জন আলিমকে যেরুপ জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেওয়া হইয়েছে, তোমাদেরকেও অনুরুপ জ্বালানো হবে । তোমরা যদি এখন বলো যে, আমরা আজাদী আন্দোলনে অংশগ্রহন করিনি তাহলে তোমাদের ছেড়ে দিব । আমার সৃস্টিকতার কসম, আমি দেখলাম যে, তাদের কোন একজন আলিমও ইংরেজদের সম্মুখে মাথা নত করেননি । বরং পুবের ৪০ জনের ন্যায় পরবতী ৪০ জনও অগ্নিস্ফুলিঙ্গে জ্বলে শাহাদাত বরন করলেন । তাদের কাউই

ইংরেজদের সম্মুখে মাথা নত করতে রাজী হলেন না ।” (উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন, পৃষ্ঠা-৭৯)

অধ্যাপক সুভাসচন্দ্র বসু লিখেছেন, “ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক প্ররোচিত সাম্প্রদায়িক ও দাঙ্গা হাঙ্গামা সত্ত্বেও দেওবন্দ গোষ্ঠী ভারতের জাতীয় সংহতি ও ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শে অটল থাকেন ।” (ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে উলামায়ে কেরামের অবদান, পৃষ্ঠা – ৩০)

তখন কোন আলেমকে দেখলেই নির্বিচারে হত্যা করা হত । পরিস্থিতি এমন হয়েছিলে যে যেখানে প্রতিটি বাড়িতে আলেম ছিল সেখানে গ্রামের পর গ্রাম কোন আলেম খুঁজে পাওয়া যেত না এমনকি কেউ মারা গেলে দাফন করার মত কোন আলেম খুঁজে পাওয়া যেত না । হতাশার ঘন অন্ধকারে ছেয়ে ফেলল ভারতীয় উপমহাদেশ ।

অপরদিকে বেনিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার জন্য একদল পদলেহী গোষ্ঠী তৈরী করল যারা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনকেই দেশবাসীর জন্য কল্যানকর বলে প্রচারণা চালাতে থাকে । এই গোষ্ঠী স্বাধীনতা সংগ্রামী উলামায়ে দেওবন্দ থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তারা একদল ভণ্ড নবী ও ভাড়াটে মৌলবী খরিদ করে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী উলামায়ে কেরামদের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার ও কুটসা রটাতে থাকে । স্বাধীনতা সংগ্রামী উলামায়ে কেরামকে রাসুল বিদ্বেষী, ওহাবী, কাফের, নবীকে বড়ভাই মান্যকারী, খতমে নবুয়াত অস্বীকারকারী, নবীকে চামার আখ্যাকারী বলে ফতোয়া দেওয়া হয় এবং এই মর্মে ফতোয়া ক্রয় করে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকে । এতে কাজ না হলে শেষ পর্যন্ত জালিয়াতি করে

ধোকাবাজি করে আরবের আলেমদেরকে ভূল বুঝিয়ে ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্রে ফতোয়া সংগ্রহ করা হয় এবং তা ‘হুসামুল হারামাইন’ নাম দিয়ে ছাপা হয় ।

ব্রিটিশ বেনিয়ারা চেয়েছিল মুসলমানরা নিজেরা আত্মকলহে লিপ্ত হয় যাতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কোন সংগ্রাম করার অবকাশ যেন না পায় । ব্রিটিশরা চেয়েছিল চিরস্থায়ীভাবে নিজেদের সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে । এই মানসে তারা বিভেদ সৃষ্টির কুটিল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং উপমহাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মাঝে সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার আগুন উস্কে দেয় । এবং স্বামী দয়ানন্দ স্বরসতীর শুদ্ধি আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার প্রয়াস চালায় । ভূমিনীতিতে পাঁচসালা ও দশসালা বন্দোবস্ত নীতি প্রবর্তন করে মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কার্যতঃ পঙ্গু করে দেয় এবং হিন্দুদেরকে জমিদারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধীকার প্রদান করে স্বাধীনতা সংগ্রামের বলিষ্ট শক্তি মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া করে দেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করে । অবস্থা দেখে এমন মনে হচ্ছিল যে, এদেশে স্বাধীনতা বুঝি আর ফিরে আসবে না কোনদিন । শিক্ষা সংস্কৃতি দ্বীন – ধর্ম সব ধ্বংস হয়ে যাবে । উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য সে ছিল এক চরম দুর্যোগের দিন ।

এদিকে স্বাধীন থানাভবন সরকারের পতনের পর আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার হযরত হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ) কোনক্রমে আত্মগোপন করে মক্কা শরীফ হিজরত করেন । সেখানে তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে পুনরায়

সংগঠিত করার চেষ্টা করেন । কিছুদিন পর কাসিম নানুতুবী ও জেল থেকে বেরিয়ে রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী মুক্তভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন । পরামর্শ শুরু হয়ে গেল কোন পথ অবলম্বন করলে দেশের নিরীহ, নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষ তাদের কাঙ্খিত স্বাধীনতা ফিরে পাবে ।

স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর থাকার ফলে এবং সংগ্রাম ও যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত থাকার কারণে দীর্ঘদিন শিক্ষার প্রতি তাকানোর সুযোগ হয়নি মুসলমানদের । তদুপরি ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি । এমনকি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও পৃষ্টপোষকতার অভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল । তার স্থানে চাপিয়ে দেওয়া বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে বিভ্রান্ত শুরু হতে শুরু করে মুসলিম যুবমানস । ফলে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা বিভ্রান্ত হয়ে হারাতে পারে হিদায়াতের পথ এবং বিজাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি দখল করে নিতে পারে নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্থান । তাহলে যে বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়ে পড়বে আরও সোচনীয় । অপরদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দেওয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের সঞ্জীবনী চেতনা বিতরন করতেন যে আলেম সমাজ তারা ইংরেজদের নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়ে অনেকেই শাহাদাত বরন করেন, ফলে নেতৃত্বের জন্য আত্মসচেতন বলিষ্ট প্রত্যয়ী ব্যক্তিত্বের অভাব অনুভূত হয় তীব্রভাবে । এমতাবস্থায় দীর্ঘ চিন্তা ভাবনা ও পরামর্শের পর আপাততঃ সশস্ত্র সংগ্রামের ধারা স্থগিত রেখে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের বলিষ্ট চেতনায় উজ্জীবিত ও দ্বীনি চেতনায় উদ্দীপ্ত একদল আত্মত্যাগী সিপাহ সালার তৈরীর মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে, দ্বীনি ইলম ও ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুনের সংরক্ষণ ও প্রচার – প্রসারের সুমহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, হাজি ইমদাদুল্লাহ

মুহাজিরে মক্কীর ইঙ্গিতে মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) এর নেতৃত্বে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রসেনানী যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গানে দ্বীনের হাতে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে মুতাবিক ১৫ই মুহাররাম ১২৮৩ হিজরীতে ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলায় দেওবন্দ নামক ছোট্ট বস্তিতে ঐতিহাসিক সাত্তা মসজিদের প্রাঙ্গনে ছোট্ট একটি ডালিম গাছের ছায়ায় একান্ত ইলহামীভাবে বর্তমান পৃথিবীর ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র বলে পরিচিত ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দের গোড়া পত্তন হয় ।

উল্লেখ্য যে, মুঘল আমলে প্রতিটি নগর গঞ্জের হাজার হাজার ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল । ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মিশর থেকে প্রকাশিত 'সুবহুল আশা' গ্রন্থের বর্ণনানুসারে রাজধানীর শহর দিল্লীতেই এক হাজার মাদ্রাসা ছিল । প্রফেসার মার্কমিলসের বর্ণনানুসারে ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে শুধু বাংলাদেশেই ছিল ৮০ হাজার মাদ্রাসা । কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কুট ষড়যন্ত্রের ফলে এই সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পড়েছিল । শুধুমাত্র দিল্লীর রহিমিয়ার মত মাত্র দু'চারটি প্রতিষ্ঠান স্ব-উদ্যোগে টিকে থাকলেও ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর এগুলোকেও বন্ধ করে দেওয়া হয় । ফলে ভারতের মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষার আর কোন প্রতিষ্ঠানই অবশিষ্ট থাকল না । এ বিষয়টি তদানিন্তন কালের জ্ঞানানুরাগী সকল আলেম উলামাদেরকেই ভাবিয়ে তুলেছিল নিঃসন্দেহে । ভারতে ইসলামী শিক্ষার ধারাকে টিকিয়ে রাখার বিকল্প কি পন্থা অবলম্বন করা যায় এই চিন্তা তখন সকলের ভাবনার জগৎকেই সম্ভবত আন্দোলিত করেছিল । এই আন্দোলনের ফলাফলই ছিল দারুল উলুম দেওবন্দ ।

দারুল উলুম দেওবন্দের সূচনা যেভাবে হয়েছিল

আসলে দেওবন্দ ছিল মাওলানা কাসিম নানুতুবী (রহঃ) এর শ্বশুর বাড়ি । পাশেই ছিল সাত্তা মসজিদ । সেখানে তিনি নামায আদায় করতেন । সেই মসজিদের পেশ ইমাম ছিলেন হাজি আবিদ হুসাইন (রহঃ) । মাওলানা জুলফিকার আলী ও মাওলানা ফজলুর রহমানও এই এলাকার বাসিন্দা ছিলেন । এইসব ব্যাক্তিগণ নামাযের শেষে প্রায়শই হাজি আবিদ হুসাইনের হুজরায় সমবেত হতেন । দেশের এমন পরিস্থিতি তাঁদেরকে ভীষনভাবে ভাবিয়ে তুলত । তাঁরা সবচেয়ে বেশী ভাবতেন ইসলামী শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে । তাঁরা সবসময় ভাবতেন ভ্রষ্টতার অন্ধকারের অতল তলে তলিয়ে যাবে কি মুসলিম মিল্লাতের নতুন প্রজন্ম । তাঁরা বিকল্প কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না । এইভাবে দীর্ঘ ৬/৭ বছর অতিবাহিত হয়ে গেল ।

একদিন সাত্তা মসজিদের ইমাম হাজি আবিদ হুসাইন ফজরের নামাজের শেষে ইশরাকের নামাজের অপেক্ষায় মসজিদে মুরাকাবা অবস্থায় ছিলেন । হঠাৎ তিনি ধ্যানমগ্নতা ছেড়ে দিয়ে নিজের কাঁধের রুমালের চার কোন একত্রিত করে একটি থলি বানালেন এবং তাতে নিজের পক্ষ থেকে তিন টাকা রাখলেন । অতঃপর তা নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন মাওলানা মাহতাব আলীর কাছে । তিনি উৎসাহের সাথে ৬ টাকা দিলেন এবং দুয়া করলেন । মাওলানা ফজলুর রহমান দিলেন ১২ টাকা, হাজি ফজলুল হক দিলেন ৬ টাকা । সেখান থেকে তিনি উঠে গেলেন মাওলানা জুলফিকার আলীর কাছে । জ্ঞানানুরাগী এই ব্যক্তিটি দিলেন ১২ টাকা । সেখান থেকে উঠে এই দরবেশ সম্রাট

‘আবুল বারাকাত’ মহল্লার দিকে রওনা হলেন । এভাবে দুইশট টাকা জমা হয়ে গেল এবং সন্ধা পর্যন্ত তিনশত টাকা জমা হয়ে গেল । জনগনের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে তিনি মিরাঠে কর্মরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী (রহঃ) এর কাছে এই মর্মে পত্র লিখেন যে, আমরা মাদ্রাসার কাজ শুরু করে দিয়েছি; আপনি অনতিবিলম্বে চলে আসুন । চিঠি পেয়ে মাওলানা কাসিম নানুতুবী (রহঃ) মোল্লা মাহমুদকে শিক্ষক নিযুক্ত করে পাঠিয়ে দিলেন এবং তাঁর মাধ্যমে মাদ্রাসার কাজ চালিয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে চিঠি দিলেন । এইভাবে গণচাঁদার উপর ভিত্তি করে শিক্ষাধারাকে সচল ও সজীব রাখার যে নতুন পদ্ধতির সূচনা হয় তা জাতির ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচিত করে । সরকারী অনুদান ছাড়াই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার এবং ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুনকে টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি নিজেদের হারানো ঐতিহ্যকে পুনরাদ্ধারের যে অভিনব ধারার সূচনা করলেন এই মনীষীরা তা জাতির ইতিহাসে এক নতুন ধারায় পরিচালিত করে । জনগণের চাঁদার উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর ইতিহাসে যে মাদ্রাসার প্রথম গোড়া পত্তন হয় তা দারুল উলুম দেওবন্দ । এ যেন এক যুগান্ত সৃষ্টিকারী ইতিহাস । এ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বাকি মাদ্রাসাও চাঁদার উপর ভিত্তি করে নির্মান করা হয় । সকলকে পথ দেখিয়েছে দারুল উলুম দেওবন্দ । সকলকে দেখিয়েছে সরকারের সাহায্য না নিয়েও কিভাবে ইসলামী সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখা যায় ।

দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতা ছয়জন মনীষীর নাম

নাম	জন্ম তারিখ	প্রতিষ্ঠাকালে বয়স	মৃত্যুর তারিখ
মাওলানা জুলফিকার আলী	১৮১৯ ইং/১২৩৭ হিঃ	৪৫ বৎসর	১৯০৪ ইং/১৩২২ হিঃ
মাওলানা ফজলুর রহমান	১৮২৯ ইং/১২৪৭ হিঃ	৩৫ বৎসর	১৯০৭ ইং/১৩২৫ হিঃ

মাওলানা কাসিম নানুতুবী	১৮৩২ ইং১২৪৮ হিঃ	৩৪ বৎসর	১৮৮০ ইং/১২৯৭ হিঃ
মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবী	১৮৩৩ ইং১২৪৯ হিঃ	৩৩ বৎসর	১৮৮৪ ইং/১৩০২ হিঃ
হাজি আবিদ হুসাইন	১৮৩৪ ইং/১২৫০ হিঃ	৩২ বৎসর	১৯১২ ইং/১৩২৮ হিঃ
মাওলানা রফিউদ্দীন	১৮৩৬ ইং/১২৫২ হিঃ	৩০ বৎসর	১৮৯০ ইং/১৩০৬ হিঃ

দেওবন্দ মাদ্রাসার মহান প্রতিষ্ঠাতারা বুঝেছিলেন যে, আদর্শ সচেতন একদল কর্মী তৈরী করে তাদের মাধ্যমে আন্দোলনের স্রোতকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া সহজ হবে । তাই চরম অর্থনৈতিক দৈন্যের মাঝেও কোনরুপ সরকারী সাহায্য – সহযোগিতা ছাড়া সম্পূর্ণ আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে এবং মুসলিম জনসাধারণের স্বতঃস্ফুর্ত দানের উপর ভিত্তি করে তাঁরা নতুন আঙ্গিকে গড়ে তুললেন প্রতিষ্ঠানটিকে । এদিক থেকে শুরু হল স্বাধীনতা আন্দোলনের আর এক নতুন অধ্যায় । পাঠদানের পাশাপাশি চলতে লাগল দেশ স্বাধীনতার শিক্ষাও । একটি সর্বজনীন ঐক্যের প্রক্রিয়াকে সামনে রেখে তৈরী করা হল তালিম ও তরবিয়াতের অবকাঠামো । ফলে অল্প দিনেই এর সুনাম সুখ্যাতি ও আবেদন ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে । অল্প দিনেই তৈরী হয়ে গেল নতুন জিহাদী কাফেলা । সুসংগঠিত হয়ে আবার তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন নতুন উদ্যম নিয়ে জিহাদের ময়দানে । দীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে এ দেশের মজলুম মানুষ ফিরে পেল তাদের বহুদিনের কাঙ্খিত স্বাধীনতা । ইসলামী শিক্ষার ময়দানে এল এক নতুন দিগন্তের অভ্যুদ্বয় । যার ফলশ্রুতিতে আজ গড়ে উঠেছে এ উপমহাদেশ সহ পৃথিবীর আনাচে কানাচে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখান থেকে প্রতিনিয়ত বিলানো হচ্ছে ইলমে দ্বীনের শারাবান তহুরা ।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (রহঃ) ও শাহ আব্দুল আজীজ দেহলবী (রহঃ) এর অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুজাহিদরা দারুল উলুম দেওবন্দের গোড়া পত্তন করেন । ভারতীয়

উপমহাদে এই দেওবন্দ মাদ্রাসার গুরুত্ত্ব অপরিসীম । স্বাধীনতা সংগ্রামে এই দেওবন্দী মুজাহিদরা পর্যুদস্ত হয়ে গেলেও তাঁরা কিন্তু মনোবল হারান নি । নতুম উদ্যম নিয়ে তাঁরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জেহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন । দেওবন্দ মাদ্রাসার মূলনীতি ছিল মুলতঃ হানাফী মাযহাবের কট্টর অনুসরণ এবং এর সাথে তীব্র ব্রিটিশ বিরোধীতা । এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানুতুবী (রহঃ) কতকগুলি মূলনীতি তৈরী করেছিলেন, সেই মূলনীতির মধ্যে ছিল জনগণের অর্থানুকূল্য, ছাত্রাবাস, পরিচালক সদস্যের আদর্শবোধ, শিক্ষকদের ত্যাগদীপ্ত মনোভাব, শাসকদের ছোঁয়াচ থেকে দূরে থাকা এবং বিপদের দিনে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল । বস্তুত জনগণের সহযোগিতা এবং স্বাবলম্বনধর্মী আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ছিল এই নীতির মূলকথা । ইসলামী ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের দ্বারা হতাশাচ্ছন্ন জাতিতে নবশক্তিতে বলীয়ান করা হল মাদ্রাসার অন্যতম লক্ষ্য । (উপমহাদেশের মুসলমান, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩০)

‘দরসে নিজামী’ নামে পরিচিত এই দারুল উলুম দেওবন্দের পাঠক্রম ছিল, কুরআন, তাফসীর, উসুলে তাফসী, হাদীস, উসুলে হাদীস, ফিকাহ, উসুলে ফিকাহ, ধর্মতত্ত্ব, জ্যাতির্বিদ্যা, গণিত, মান্তিক (দর্শন ও তর্কবিদ্যা), ইলমে কালাম প্রভৃতি বিষয়বস্তু ।

মাওলানা কাসিম নানুতুবী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রদের শারিরিক শিক্ষার ব্যবস্থায় সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং

আধা সামরিক অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি তাঁদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থাও করেছিলেন । বিরোধীরা তাঁর সমালোচনা ও বিদ্রুপ করে বলত মাওলানা কাসিম নানুতুবী তাঁর মাদ্রাসাকে 'মাদ্রাসা – ই – আরাবীয়া' না করে 'মাদ্রাসা – ই – হারবীয়া' বা সেনা বিদ্যালয় করেছেন ।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানুতুবী (রহঃ) ইন্তেকাল করেন । তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন কুতুবে রব্বানী মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) । তিনি শুধু কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভই করেন নি, তিনি তাঁর মুর্শিদ হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী থেকে চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশবন্দিয়া এবং সোহরাবর্দিয়া তরিকায় আধ্যাত্মিক উৎকর্ষও লাভ করেছিলেন ।

দারুল উলুম দেওবন্দের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

অষ্টাদশ শতকে মূলতঃ মুসলমানদের কাছে দুটি সমস্য বিদ্যমান ছিল তার মধ্যে একটি হল ব্রিটিশদ বেনিয়াদের অবৈধ রাজনৈতিক আগ্রাসন অপরটি হল ধর্মীয় জটিলতা ।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অবৈধ আগ্রাসনের ফলে যে চরম দুর্ভোগ ও চরম নির্যাতনের শিকার হয়ে ভারতীয় মুসলমানদের যে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এর আগে করা হয়েছে । এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার ফলে ধর্মীয় যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা ছিল নিম্নরুপঃ

১) ইংরেজরা তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার কুপ্রভাব এ দেশের যুবমানসে প্রবেশ করিয়ে তাদের মস্তিস্ককে ইউরোপীয়া ধাঁচে গড়ে তোলার মানসে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার উপর মারাত্মকভাবে হস্তক্ষেপ করেছিল । মুসলমানরা দীর্ঘ ৭০০ বছর রাজত্ব করার সময় যে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটেছিল তা পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য প্রয়াস চালায় । তাই ব্রিটিশরা বুঝেছিল প্রকাশ্যে ঘোষনার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থাকে বাতিল করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে এবং বিরাট গণবিদ্রোহ দেখা দিতে পারে যা তাদের পক্ষে ঠেকানো মুশকিল । তাই ব্রিটিশ বেনিয়ারা ষড়যন্ত্র করে ইসলামী প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দকৃত জায়গীরগুলি বাতিল করে দেয় এবং প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস ওয়াকফ সম্পত্তিগুলি বাজেয়াপ্ত করে প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের পথ রুদ্ধ করে দেয় । মুসলিম শাসনকালে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যে অর্থ সাহায্য করা হত তাও বন্ধ করে দেওয়া হয় । ফলে ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলি মুখ থুবড়ে পড়ে । এই সুযোগে ব্রিটিশরা পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে তাদের স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠা করে । ফলে ইসলামী শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির অগ্রগতি ব্যাহত হয় । এসকল প্রতিকুলতার মাঝে মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক তেমন কোন সুব্যবস্থায় আর বাকি ছিল না ।

২) ইংরেজরা আসার আগে এদেশে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল তা এক এক কেন্দ্রে একেক বিষয়ের শিক্ষার জন্য বিখ্যাত ছিল । কোনটি মানতিকের জন্য বিখ্যাত ছিল, কোনটি ফিকাহ – উসুলে ফিকাহ এর জন্য বিখ্যাত ছিল, আবার কোনটি ইলমে কালামের জন্য বিখ্যাত ছিল । তাই যাঁরা যে বিষয়ের উপর শিক্ষা লাভ করতেন তাঁদের

কাছে অন্য বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ম্লান হয়ে যেত । এতে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে যিনি মানতিক ভাল জানতেন তিনি মানতিক না জানা ব্যক্তিদেরকে আলেমই মনে করতেন না, যদিও তিনি অন্য বিষয়ের উপর বিদগ্ধ পণ্ডিত । অনুরুপ কালাম শাস্ত্রের পণ্ডিতরা ফিকাহ শাস্ত্রের পণ্ডিতদেরকে আলেম মনে করতেন না । এভাবে আলেমদের নিজেদের মধ্যে এক বিদ্বেষ ও বৈরিতা সৃষ্টি হয় । এই বিদ্বেষ ও বৈরিতা ধর্মীয় শিক্ষিতদের মাঝে এক আত্মঘাতী পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল ।

৩) এদেশে চারটি আধ্যাত্মিক ধারা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে । যথাঃ- কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দীয়া ও সোহরাবর্দীয়া । এই চারটি ধারাই মূলতঃ বিশুদ্ধ মত ও পথের উপর প্রতিষ্ঠিত । এদের মধ্যে মৌলিক আকিদাগত কোন পার্থক্য নেই । তবুও এক তরিকার অনুসারীরা নিজেদের তরিকার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে অন্য তরিকাকে তুচ্ছ করার পরিণতিতে এই ধারাসমূহের অনুসারীদের মাঝে বিদ্বেষ ও বৈরিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয় – ধর্মীয় পরিবেশকে আরও জটিল করে তোলে ।

৪) এদেশে ধর্মীয় শিক্ষার পরিবেশ না থাকার সুযোগে নানা ধরণের আকিদাগত বিভ্রান্তি ও কুসংস্কারের শিকার হয়েছিল উপমহাদেশের মুসলমান । এছাড়াও বিভিন্ন বিদআতী গোষ্ঠী ও মাযহাব বিরোধী গোষ্ঠীর উত্থান হয় । প্রত্যেক দলই নিজেদেরকে হক ও বিরোধীদেরকে বাতিল সাব্যস্ত করত । ফলে সাধারণ মানুষের জন্য সঠিক দ্বীন ও কুসংস্কারের মাঝে পার্থক্য সূচিত করতে পারত না । এই সমস্যা এখনও রয়েছে কিন্তু সূচনা হয়েছিল সেই ব্রিটিশ জামানায় ইংরেজ বেনিয়াদের ষড়যন্ত্রে ।

সেই সময় বিদআতীরা নিজেদেরকে খাঁটি আশিকে রসুল বলে উল্লেখ করে মিলাদ-কিয়াম, ফাতেহা, উরুষ, চল্লিশা প্রভৃতি শিরক বিদআতের কুসংস্কারকে সমাজে ছড়িয়ে দিতে থাকে আর হাক্কানী আলেমদেরকে রসুল বিদ্বেষী, ওহাবী, কাফের, বেদ্বীন বলে অপপ্রচার চালাতে থাকে । ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় এসকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির প্রয়াসে লিপ্ত হয় । ইংরেজরা তাদের তল্পী বাহনের জন্য গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে মিথ্যা নবীর দাবীদার বানিয়ে এবং আল মুখতার (আহমদ রেযাকে) মুজাদ্দিদ বানিয়ে ধর্মীয় অঙ্গনে একটি নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল ।

৫) এদেশে মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করার জন্য খ্রীষ্টান পাদ্রীদেরকে আমদানী করা হয় । তারা ইসলাম ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এবং খ্রীষ্টান ধর্মকে হক প্রামাণের জন্য বিভিন্ন ধরণের যুক্তি তর্কের আশ্রয় নেয় এবং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় । আর্য সমাজের প্রতিনিধি স্বামী দয়ানন্দ স্বরসতীও খ্রীষ্টান পাদ্রীদের মতো ইসলাম ধর্মের উপর আক্রমণ চালান এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ দিয়ে ইসলামের অসারতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন এবং মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করেন ।

৬) সে সময় এদেশের নাজুক পরিস্থিতি ছিল যে, যারা জ্ঞানের চর্চা করতেন তাঁরা অধিকাংশ রুহানিয়াত (আধ্যাত্মিকতা) থেকে দূরে অবস্থান করতেন, যাঁরা রুহানিয়াত অর্জনে ব্রতী হতেন তাঁরা জ্ঞান চর্চার জগৎকে ভূলেই যেতেন । এভাবে জ্ঞান চর্চা ও

রুহানিয়াত দুটি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করে । এতে ইলম ও আমলের সমন্বয় সম্ভব হচ্ছিল না ।

৭) এ সময় দেশে ইংরেজী সভ্যতার ব্যাপক চর্চার ফলে মানুষ প্রবৃত্তির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল । ফলে প্রবৃত্তির পুজার ধ্বংসাত্মক সয়লাবে ইসলামী অনুশাসনের অনুবর্তিতার পরিবেশ নষ্ট হয় । মানুষ আমলী ও চরিত্রের ক্ষেত্রে দারুন অবক্ষয়ের শিকার হয় ।

মূলতঃ এইসব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলোকে সামনে রেখেই মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানুতুবী (রহঃ) দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠা করেন । সুতরাং বলা যায় উপরিউক্ত সমস্যা নিরসনের চিন্তা ভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছে দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য । দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পর শুরু হয় এই মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করে ভারত স্বাধীন করার দিগন্ত উন্মোচনকারী সংগ্রাম । যা পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোথাও নজীর নেই ।

উদ্দেশ্যসমূহের সার সংক্ষেপঃ

১) এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার ক্ষেত্র সামগ্রিকতা সৃষ্টি এবং একটি ব্যাপকতর শিক্ষা সিলেবাসের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনীন করে তোলা । শিক্ষার ব্যাপক প্রচার – প্রসারের ব্যবস্থা করণের মাধ্যমে দ্বীনের খিদমত করা ।

২) আ'মল ও আখলাকের প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জীবনে ইসলামী ভাবাদর্শের বাস্তব প্রতিফলন ঘটানো ।

৩) ইসলামের ব্যাপক প্রচার – প্রসারের লক্ষ্যে সমাজের চাহিদার নিরিখে যুগসম্মত কর্মপন্থা অবলম্বন এবং খায়রুল কুরুনের (উত্তম যুগের) ন্যায় আখলাকী ও আমলী চেতনা সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া ।

৪) সরকারী প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে ইসলামী শিক্ষা – দীক্ষা ও চিন্তা চেতনার স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখা ।

৫) দ্বীনি শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে এধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা, এবং সেগুলোকে দারুল উলুমের সাথে সংশ্লিষ্ট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

দারুল উলুম দেওবন্দের দীর্ঘকালের মুহতামীম কারী তাইয়্যিব (রহঃ) দারুল উলুমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নিম্নোক্ত শিরোনামে তা উল্লেখ করেছেনঃ

১) মাযহাবিয়াত বা মাযহাব (হানাফী) ও আদর্শের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা ।
২) দায়েম আজাদী বা সামগ্রিক ও চিরস্থায়ী স্বাধীনতা অর্জন ।

৩) মেহনত পাবন্দী ও সাদগী বা পরিশ্রমী ও লৌকিকতা বিবর্জিত সহজ সরল জীবনধারা অবলম্বনের অভ্যাস গঠন ।

৪) আখলাক ও বুলন্দ কিরদার বা আত্মিক ও নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন ও এক্ষেত্রে অনুপম নমূনা তৈরী ।

৫) ইনহিমাকে ইলমী বা শিক্ষাদীক্ষায় আত্মমগ্নতার পরিবেশ গড়ে তোলা ।

কারী তাইয়্যিব (রহঃ) এই পাঁচটি শিরোনামের মধ্য দিয়ে দারুল উলুম দেওবন্দের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অতি সুক্ষ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে দারুল উলুম দেওবন্দের একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে ।

বস্তুতঃ দারুল উলুম তার শিক্ষার্থীদের মাঝে এক দিকে যেমন দ্বীনী ইলমের ক্ষেত্রে গভীর পাণ্ডিত্য সৃষ্টির প্রয়াস গ্রহণ করেছে তেমনি প্রতিটি শিক্ষার্থীকে আমেলে শরীয়াত ও হামেলে দ্বীন হিসাবে গড়ে তোলার চুড়ান্ত প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে । স্বাধীনতার চেতনায় অনুপ্রাণিত করে দেওয়া হয়েছে প্রতিটি শিক্ষার্থীর অন্তরকে । যাতে তরবারীর জিহাদের সাথে সাথে চারিত্রিক ও আদর্শিক চেতনার শানিত তরবারীকে কাজে লাগিয়ে দ্বীনের হেফাজত করতে ও ব্রিটিশ বেনিয়াদের কবল থেকে স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয় । যেন মসি (কলম) হয়ে উঠে অসির (তরবারীর) ছেয়েও ক্ষুরধার, বক্তৃতার প্রতিটি বাক্য যেন হয়ে উঠে বুলেটের চেয়েও বেগবান, তাদের আখলাক ও আমল দেখে শত্রু যেন কাত হয়ে যায়, তাদের আত্মশক্তি ও রুহানিয়াতের দ্বারা শত্রু যেন হয়ে পড়ে পরাভূত । দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে পাশ করা প্রতিটি উলামায়ে কেরামের মাঝে আমরা এরই বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাই । শিক্ষা ও গবেষণার ময়দানে তাঁরা একেক

জন ছিলেন জ্ঞানের সাগরতুল্য বিদগ্ধ গবেষক, রচনার ক্ষেত্রে তাঁদের কেউ কেউ হয়ে উঠেছিলেন দক্ষ কলম সৈনিক, রাজনীতির ময়দানে ছিলেন প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ, সকল প্রকার কুপ্রথা ও রুসুমাতের বিরুদ্ধে তাঁরা ছিলেন খড়্গহস্ত, অন্যায়ের প্রতিবাদের তাঁরা ছিলেন বজ্রকণ্ঠ, স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁরা ছিলেন আপোষহীন যোদ্ধা । অন্যদিকে তাকওয়া ও খোদাভীরুতায় তাঁরা ছিলেন বে-নজীর ও বেমিসাল । সুন্নত নববীর অনুসরণ ছিল তাঁদের কর্মের চেতনা, আল্লাহ ও রসুলের ভালবাসা ছিল তাঁদের আত্মশক্তির উৎস ।

অবশ্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সামান্য মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । অনেকেই মনে করেন দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠার একমাত্র লক্ষ্য ছিল দ্বীনী ইলমের মৃতপ্রায় ধারার পুনরুজ্জীবন দান । যেমন, ইয়াকুব নানুতুবী (রহঃ) ১৩০১ হিজরী সালে দারুল উলুমের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী জলসায় বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেছিলেন, “এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র ইলমে দ্বীন শিক্ষা ও চর্চার জন্য হয়েছে ।” পক্ষান্তরে দারুল উলুমের প্রথম ছাত্র শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) বলেছেন, “মাদ্রাসা আমার সম্মুখে প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আমি খুব ভালভাবেই জানি যে, হযরত উস্তাদে মুহতারাম (মাওলানা কাসিম নানুতুবী) কোন উদ্দেশ্যে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৭ সালের ব্যর্থতার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ।”

শায়খুল হিন্দের এই বক্তব্য থেকে বুঝা যায় এই মাদ্রাসা মৃতপ্রায় দ্বীনী ইলমের পুনরুজ্জীবনের পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনকে জোর কদমে চালানোর উদ্দেশ্যেই এই দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা পরবর্তীকালে এই

মাদ্রাসা থেকে পাশ করা উলামায়ে কেরামরা সরাসরি স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া এবং ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতায় সামিল হওয়া দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার অন্যতম মূল লক্ষ্য দেশকে স্বাধীন করা তা স্পষ্ট বুঝা যায় ।

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুবী (রহঃ)

স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর বিপ্লবী কাসেমুল উলুম ওয়াল খায়রাত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুবী (রহঃ) জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে যেদিন সৈয়দ আহমদ শহীদ বালাকোটের প্রান্তরে শিখ হায়েনাদের হাতে শহীদ হয়েছিলেন । হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুবী (রহঃ) এর অমর কীর্তি হল দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার স্থাপন । যে মাদ্রাসা থেকে হাজার হাজার উলামায়ে কেরাম বেরিয়ে এসেছেন এবং আজীবন ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন । কারণ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) এর ভাষায় দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাই হয়েছিল ইংরেজদেরকে এদেশ থেকে উৎখাত করার জন্য । "মাদ্রাসা আমার সম্মুখে প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আমি খুব ভালভাবেই জানি যে, হযরত উস্তাদে মুহতারাম (মাওলানা কাসিম নানুতুবী) কোন উদ্দেশ্যে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৭ সালের ব্যর্থতার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ।"

যেসময় মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুবী (রহঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সময় ইংরেজ স্বৈরাচারীদের হিংস্র থাবা ও অকথ্য নির্যাতনে ভারতবর্ষের নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিস্পষিত, নিগৃহীত ও নিরীহ মুসলিম জনগোষ্ঠী অতিষ্ঠ হয়ে যখন প্রায় নিরাশ

হয়ে পড়েছিল । ক্রমবর্ধমান নিপীড়নে যখন মুসলমানদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছিল । যখন প্রায় গোটা বিশ্ব জুড়ে তাদের একক কর্তৃত্ব কায়েম করে মুসলমানদের ধন-সম্পদ, ইজ্জত-আব্রু, এমনকি জীবন নিয়েও হোলি খেলায় মেতেছিল । যখন দৃষ্টি সীমা জুড়ে শুধু মুসলিম নির্যাতন ও মুসলিম নিধনের ভয়াল চিত্রই ফুটে উঠেছিল । ইতিহাসের এহেন সন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষের প্রতিটি আদম সন্তানের মনোজগতে জেগে উঠেছিল স্বাধীনতা লাভ করে সুদীর্ঘ গোলামীর দুঃসহ জীবন থেকে মুক্তির এক অদম্য স্পৃহা । গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছিল নিদ্রা বিভোর জাতি তাদের অঘোর ঘুম থেকে । চোখ কচলাতে কচলাতে ঘুম থেকে জেগে তারা হতবাক হয়ে পড়েছিল । অবাক চাহনিতে সবাই অপলক নেত্রে এক ভয়াল পরিস্থিতি অবলোকন করছিল । সুগভীর ষড়যন্ত্র এবং সুদীর্ঘ গোলামীর পাতা ফাঁদ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল । ব্রিটিশ বেনিয়াদের এত সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের কথা সরলমনা মুসলিম জনগোষ্ঠী এতদিন তেমন করে ভাবেনি । সবকিছু উপলব্ধি করে এবার মুসলিম জনগোষ্ঠী কাফেরদের গোলামীর শৃঙ্খল ছিন্ন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল । কারণ পূর্বেই ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের অনির্বান মশাল প্রজ্জ্বলিত করেছেন সফল বিপ্লবী নেতা টিপু সুলতান (রহঃ) । পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার শ্লোগান তিনিই নিজের তাজা রক্তের হরফে লিখে গেছেন । আর আজো সে চেতনার আগুন নিভে যায় নি । হ্যাঁ, এখন প্রয়োজন সামান্য কিছু খড়কুটো দিয়ে তা পুনপ্রজ্জ্বলিত করে দেওয়া । তাই দেশ ও জাতির এই ক্রান্তি লগ্নে অতিব প্রয়োজন ছিল মুহাম্মাদ কাসিম নানুতুবী (রহঃ) – এর মত একজন বীর বাহাদুরের । আর সত্যিই সবাই যেন তাঁর অপেক্ষায় ছিল । এরই সূত্র ধরে তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় উলামা-মাশায়েখগণ এক জরুরী কনভেশন আহ্বান করেন । সেই

কনফারেন্সে উপস্থিত সুধীবৃন্দ সুদীর্ঘ ইংরেজ দুঃশাসনের লোমহর্ষক ফিরিস্তি জাতির সামনে তুলে ধরেন । পেশ করেন ইংরেজদের সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের নীল-নকশা, তার ভয়াবহতা ও অনিবার্য পরিণতির চিত্র । এই কনফারেন্সে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মভাবে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং পরাধীনতার জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে শাহাদাত বরণ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করাকে শ্রেয় বলে ব্যক্ত করা হয় । উক্ত পরামর্শসভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, এখন থেকে নিয়মিত সশস্ত্র জিহাদ পরিচালিত হবে এবং অত্যন্ত গোপনে যুদ্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে । [সূত্রঃ ইউরোপ কে সঙ্গীন মুজরিম, মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকী শহীদ (রহঃ), পাকিস্তান]

শামলীর ময়দায়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দামামা বেজেছিল সেই মুসলমানদের পক্ষে সেই যুদ্ধের সেনাপতি বা সিপাহসালার ছিলেন মাওলানা কাসিম নানুতুবী (রহঃ) । প্রকৃত ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বীর যোদ্ধা মাওলানা কাসিম নানুতুবী (রহঃ) তাঁর অনলবর্ষী বক্তৃতা, জিহাদী ভাষণ, সুনিপুন যুক্তিমালা ও অকাট্য প্রামাণাদির মাধ্যমেই উপরোক্ত পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণকারীগণ ইংরেজ দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন । অনেকে যুক্তি দিয়ে বলেছে যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ঠিক হবে না, কেননা, তাদের সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র বেশী আর আমাদের সংখ্যা কম । তাঁর ঈমানী শক্তির সামনে অস্ত্র ও সৈন্যের অপ্রতুলতার অজুহাট টিকেনি । তিনি উলটো তাদেরকে প্রশ্ন করেন, “আমরা কি সংখ্যায় ‘বদরের’ চেয়েও কম ।” (রুমুজে কাওসার, পৃষ্ঠা-২২৩)

মুক্তি পাগল মুজাহিদরা মাওলানা কাসিম নানুতুবীর নেতৃত্বে জিহাদী যাত্রা অভিযান করল এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বীরদর্পে যুদ্ধ করেছিল । কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই যুদ্ধে

মুজাহিদ বাহিনী পরাজিত হয়েছিল এবং আমীরুল মোমেনীন হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী মক্কার হিজরত করেন, সেনাপতি কাসিম নানুতুবী আত্মগোপন করেন এবং প্রধান বিচারপতি রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী গ্রেফতার হন এবং দীর্ঘদিন ব্রিটিশদের জেলে নির্যাতন সহ্য করেন । এর আগে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতাকামী আলেম সমাজের নেতৃত্বে সেই চেতনা সিপাহী জনতার গণবিদ্রোহের রুপ ধারণ করে । পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে সেনাবাহিনীর অব্যন্তরে এনফিল্ড রাইফেলে শূকর ও গরুর চর্বি মিশ্রিত টোটা ব্যবহারে অসম্মতি জ্ঞাপনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেনাবাহিনীতে যে বিদ্রোহ দেখা দেয় তা ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীদের প্রধান প্রধান কেন্দ্র – দিল্লী মিরাট, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেরেলী ও ঝাঁসীসহ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে । তার সাথে এদেশের স্বাধীনতাকামী জনতা একাত্ম হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে । সারা দেশের আনাচে কানাচে দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে এ যুদ্ধ । এ সময় মূল নেতৃত্ব দেওয়া হয় দুটি কেন্দ্র থেকে । এর একটি ছিল দিল্লীর সন্নিকটে থানাভবনে আর অপরটি ছিল আম্বালায় । দিল্লী কেন্দ্রিক অঞ্চলের নেতৃত্বে ছিলেন হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মাওলানা কাসিম নানুতুবী প্রভৃতি উলামাবৃন্দ । ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় সে অঞ্চলে তাঁরা একটি স্বাধীন সরকারের ঘোষনাও দিয়ে ফেলেছিলেন । হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীকে আমীর, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীকে প্রধান বিচারপতি ও কাসিম নানুতুবীকে প্রধান সেনাপতি করে এ সরকারের অবকাঠামো ঘোষণা করা হয় । অপর কেন্দ্রটি ছিল আম্বালায় যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মাওলানা জাফর থানেশ্বরী ও মাওলানা ইয়াহইয়া আলী । তাছাড়া কানপুরেও স্বাধীন সরকারের ঘোষনা করা হয় । সৈয়দ আহমদ শহীদের খলিফা আজিমুল্লাহ খান ও নানা

সাহেব এর নেতৃত্ব দেন । অযোধ্যায় এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সাবেক অযোধ্যার বেগম হযরত মহল ও আমানুল্লাহ । বেরেলীতে নেতৃত্ব দেন হাফেয রহমত খানের বংশধর খান বাহাদুর খান । খান বাহাদুর খান নিজকে দিল্লীর সম্রাটের স্থানীয় প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেন । স্বাধীনতাকামীরা দিল্লী দখল করে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারত সম্রাট বলে ঘোষণা দেয় । পাটনা ও সিত্তানায়ও তখন পর্যন্ত পুরাতন কেন্দ্রগুলি বিদ্যমান ছিল । সেখান থেকেও স্বাধীনতার চেতনা অব্যাহতভাবে বিতরণ করা হতে থাকে ।

লর্ড ক্যানিং বলেছেন, “মহাবিদ্রোহ দমন করার পর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর এলাহাবাদে মহাবিদ্রোহের তিনি প্রধান সমর নায়ক মাওলানা কাসেম নানুতুবী, মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী ও হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী ব্যাতীত সমস্তকে মহারানী ভিক্টোরিয়ার পক্ষ থেকে নিঃশর্ত ক্ষমা ও নিরাপত্তার ঘোষণা দেন ।” (ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে উলামায়ে কেরামের অবদান, পৃষ্ঠা-২৭)

হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) মাওলানা কাসিম নানুতুবী (রহঃ) সম্পর্কে লিখতে গিয়ে স্বীয় কিতাব ‘নকশে হায়াত’ এ লিখেছেন, “শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) – এর ইলমী গভীরতা অনস্বীকার্য কিন্তু হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী (রহঃ) – এর লেখা কিতাবে ইলম ও প্রজ্ঞার যে গভীরতা পরিদৃষ্ট হয়, তা শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ) – এর কিতাবেও নেই ।”

আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান দীর্ঘদিন পর্যন্ত মাওলানা কাসিম নানুতুবীর সহপাঠি ছিলেন । উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা হওয়া সত্ত্বেও

তিনি কাসিম নানুতুবী (রহঃ) সম্পর্কে এক জায়গায় লিখেছেনঃ- “সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) – এর তিরোধানের পর ইসলামের ইতিহাসে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) – এর মত বড় দার্শনিক আজ পর্যন্ত আর দেখা যায় নি ।”

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের গৌরব দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা মাওলানা কাসিম নানুতুবীর শিক্ষা জীবনের একটি স্বপ্নেরর বাস্তবায়ন । তাঁর জীবনীগ্রন্থে উল্লেখ আছে, ছাত্র জীবনে তিনি একবার স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি কাবা শরীফের ছাদে দাঁড়িয়ে রয়েছেন । এই সময় তাঁর দেহ থেকে পানি বের হয়ে হাজার হাজার নদী-নালা বয়ে যাচ্ছে । বিস্ময়কর এই স্বপ্নটি তাঁকে বিস্ময়াভূত করে তোলে । পরে তিনি স্বপ্নের এই বৃত্তান্ত তাঁর সম্মানিত ও সুযোগ্য পিতার নিকট বর্ণনা করেন । উত্তরে তাঁর পিতা বলেন, এর ফলাফল হল, তোমার মাধ্যমে দ্বীনি ইলমের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে । তুমি হবে এর উৎস । আর হয়েছিলও তাই । তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করেন এবং দ্বীনি শিক্ষার আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে । এবং এর উৎস হলেন মাওলানা কাসিম নানুতুবী (রহঃ) ।

হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসিম নানুতুবী ছিলেন সুন্নতের অত্যন্ত পাবন্দ । সুন্নতের প্রতি তাঁর এতই অনুরাগ ছিল যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর যখন মাওলানা কাসিম নানুতুবীকে গ্রেফতার করার পরওয়ানা (Arrest Warent) জারি হয়ে গেল তখন তিনি তিন দিন আত্মগোপন করে থাকেন । তিন দিন পর বেরিয়ে আসার

পর তাঁর সঙ্গী-সাথীরা তাঁকে পুনরায় আত্মগোপন করার পরামর্শ দিলেন । উত্তরে তিনি বলেন, “আমার প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত কালে মাত্র তিন দিন পর্বত গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন । তাই আমিও মাত্র তিন দিনই আত্মগোপন করেছি । এর বেশী এক মুহুর্তও আত্মগোপন করে থাকা আমার জন্য আদৌ শোভনীয় নয় । আমার লজ্জা বোধ হয় যে, কি করে আমি প্রিয় নবী হযরত (সাঃ) এর চেয়ে বেশী সময় আত্মগোপন করে থাকি ।”

তিনি রাসুল (সাঃ) এর শানে শায়রী লিখেছেন,

সবসে পেহেলে মা’শিয়াত কে আনওয়ার সে
নকশে রুহে মুহাম্মাদ বানায়া গিয়া
ফির উসি নকশ সে মাঙ্গ কর রৌশনী
বজমে কৌনো মাকাঁ কো সাজায়া গিয়া ।
হাশর কা মুঝ কো গম হো কাসিম কিস লিয়ে
মেরা আকা হ্যায় ওহ মেরা মৌলা হ্যায় ওহ
জিসকে কদমো মে জান্নাত বাসায়ী গয়ী
জিসকে হাথো সে কাওসার লৌটায়া গায়া ।

এছাড়াও তিনি এত বড় আশেকে রাসুল ছিলেন যে, মদীনা শহরে প্রবেশের ৭ মাইল আগে তিনি জুতো খুলে নিতেন । এটা তিনি এই জন্যই করতেন যে চৌদ্দশ বছর

আগে মহানবী (সাঃ) এর পথে হাঁটাচলা করেছেন । সেখানে জুতো পরে গেলে বেয়াদবী হয়ে যাবে ।

মাওলানা কাসিম নানুতুবী ছিলেন খালেস ও দুনিয়াবিমুখ আলেম । নিম্নের ঘটনাটি এর জ্বলন্ত প্রমাণ । একবার হায়দ্রাবাদের নবাব তাঁর নিকট চিঠি লিখলেন যে, আপনি আমার দরবারে আসুন । এখানে আপনি প্রত্যহ মাত্র এক ঘন্টা করে পড়াবেন । সম্মানী হিসাবে আপনাকে প্রতি মাসে সাত'শ টাকা প্রদান করা হবে । নবাবের চিঠির উত্তরে তিনি লিখলেন, নবাব সাহেব! আমি মাদ্রাসা থেকে দশ টাকা বেতন পেয়ে থাকি । এর ছয় টাকায় আমার যাবতীয় প্রয়োজনীয় পূরণ হয়ে যায় । দু'টাকা পিতার জন্য পাঠিয়ে দিই । আর দু'টাকা আমার অবশিষ্ট থেকে যায় । এই দু'টাকা আমি কোথায় খরচা করবো সে জায়গা খুঁজে পাচ্ছি না । আর আপনি যে আমাকে এত টাকা দিতে চাচ্ছেন, তা আমি কোথায় খরচা করবো? মাওলানা কাসিম নানুতুবীর এর দুনিয়া বিমুখ এ উত্তর পেয়ে নবাব এত বেশী প্রভাবিত হন যে, নবাব সাহেব হযরতের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য চলে আসেন । নবাব সাহেব ফিরে যাওয়ার সময় এক থলে রৌপ্য মুদ্রা হযরতের সমীপে হাদীয়া স্বরুপ পেশ করেন । তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান । এবং আগের বক্তব্যটাই বলেন যে এতা টাকা খরচ করবো কোথায়? ফলে নবাব সাহেব ফেরার সময় ঐ টাকাগুলো হযরতের পাদুকাযুগলের মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে যান । পরে মাওলানা কাসিম নানুতুবী সাহেব জুতা পরিধান করতে গিয়ে দেখেন জুতোর মধ্যে টাকার পাহাড় পড়ে আছে । এ অবস্থা দেখে তিনি জুতো ঝেড়ে টাকাগুলো ফেলতে ফেলতে বললেন, এই দেখ! আমরা দুনিয়াকে এত উপেক্ষা ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করি কিন্তু

তবুও তা শেষ পর্যন্ত আমাদের জুতোয় এসে পড়ে থাকে । এ বলে তিনি গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হলেন । আর একটি বারের জন্যও টাকাগুলোর দিকে ফিরে তাকালেন না ।

মাওলানা কাসিম নানুতুবী (রহঃ) সারা জীবন ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করেছেন এবং ব্রিটিশদের ইসলাম বিধ্বংসী কর্ম-কাণ্ড ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন এবং তিনি ব্রিটিশদের বিতাড়নের জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন । তিনি এতটাই ব্রিটিশ বিরোধী ছিলেন যে তিনি বলেছেন, “আমার ইচ্ছা যে, দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিটি ছাত্রই ইংরেজদের অবস্থানে আঘাত হানবে এবং এই মাদ্রাসার কল্যানপ্রাপ্ত সকলেই ইংরেজদের জন্য প্রাণ সংহারর বিষতুল্য হবে । ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপরাধে যদি দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিটি ইট খুলে নেওয়া হয় তবুও তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত থাকবে ।”

তিনি তিরোধানের পরও তাঁর দুর্বার আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য সংগ্রামী আলেম তৈরীর কারখানা ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ ‘দারুল উলুম দেওবন্দ’ রেখে যান । যে বিদ্যাপীঠ যুগ যুগ ধরে শিক্ষা, চরিত্র, রাজনীতি, আধ্যাত্মিকতা ও জিহাদের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অবদান রেখে চলেছে ।

মাওলানা কাসিম নানুতুবী জিহাদ, দরস ও তাদরীসের পাশাপাশি লিখনীর জগতেও বিরাট অবদান রেখে গেছেন । তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ত্রিশ (৩০) এর অধিক । এগুলির মধ্যে ‘তাহযীরুন নাস’, ‘আবে হায়াত’, ‘মুনাযারায়ে আজিবা, ‘জামালে কাসমী’,

'শাহাদাতে ইমাম হুসাইন (রাঃ)', 'কিয়া মুক্তাদী পর সুরা ফাতেহা পঢ়না ওয়াজীব হ্যায়' প্রভৃতি ।

এই মনীষীর সংগ্রামী জীবন সত্যিই আমাদের জন্য একটি অনুসরণীয় আদর্শ, চেতনার অগ্নিমশাল ।